১৪.১ প্রস্তাবনা

Thomas Babington Macaulay-র দর্শনে অনুপ্রাণিত যে শিক্ষাব্যবস্থা ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে প্রবর্তন করেছিল, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার দৌলতে শিক্ষিত ভারতবাসী ইংলন্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর সব কটি পত্নীর নাম জানতেন কিন্তু প্রতিবেশী মহাদেশ আফ্রিকা সম্পর্কে কোন খবর রাখতেন না। ইউরোপ প্রচার করেছিল আফ্রিকার কোন ইতিহাস নেই এবং 'racial hierarchy'-তে শ্বেতকায়রা, সর্বশীর্ষে এবং কৃষ্ণকায়রা সর্ব নিম্নে। আফ্রিকার গায়ে 'dark continent'-এর যে তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতবর্ষ সেটাই গ্রহণ করল। শিক্ষা সহায়কের কাজ হবে সেই অপপ্রচার যে কত ভ্রান্ত সেটা বোঝান।

- ইউরোপের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের অনেক আগেই আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে বিশাল সাম্রাজ্যের আবির্ভাব হয়েছিল, মজবুত প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী হয়েছিল, বিদেশের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল—তার বিশদ বিবরণ আরব ঐতিহাসিক, ভ্রমণকারী এবং সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়।
- যে মহাদেশ নেলসন মেন্ডেলার মত ব্যক্তিত্ব, Wole Soyinka-র মত লেখক, Edward Wilmot Blyden-র মত তীক্ষ্ণধী বুদ্ধিজীবি পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে, শুধু কৃষ্ণকায় হওয়ার জন্য আফ্রিকানদের মস্তিষ্কের বিকাশ সম্ভব নয় Racial hirarchy-র মত অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রসূত এই ধরণের সিদ্ধান্ত কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।
- আফ্রিকার দেশগুলি ও নেতাদের নাম ইংরেজীতে দেওয়া হয়েছে। বাংলায় দিলে এক ধরনের বিকৃতি ঘটত। আমাদের বিশ্বাস নামগুলির শুদ্ধ বানান জানলে পাঠকদের উপকার হবে।
- আশা করি শিক্ষা সহায়করা বৈঠক পরিচালনার সময় মানচিত্র ব্যবহার করবেন। মানচিত্রবিহীন ইতিহাস পড়ানো অনুচিত।

সারাংশ

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক অভিযানের যুগে আফ্রিকা ও ইউরোপের সম্পর্কের শুরু। প্রথমে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের আদানপ্রদানের ভিত্তিতে ব্যবসা, পরে দাস ব্যবসা এবং আরও পরে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার—এই তিন অধ্যায় ইউরোপ ও আফ্রিকার সম্পর্কের দ্রুত বিবর্তন ঘটে। ইংলন্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, ইতালি, জার্মানি বেলজিয়াম, স্পেইন—সব দেশ আফ্রিকাকে ছিঁড়ে খাবার দৌড়ে নেমেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে সাব-সাহারান আফ্রিকা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপনিবেশে পরিণত হল এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে এক শ্বেতকায় গোষ্ঠী সংখ্যালঘু-সরকার গঠন করে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে 'বৃহত্তর আফ্রিকায়'—অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কৃষ্ণকায়দের মধ্যে এক ধরণের জাগরণের সূচনা হয়। কৃষ্ণাঙ্গারা তাদের নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে গর্বের সঙ্গে সেটা ঘোষণা করতে শুরু করল। কৃষ্ণকায়দের আত্মসমীক্ষা সাহিত্য ও বিভিন্ন ধরনের সংগঠন প্রতিষ্ঠায় প্রতিফলিত হয়। স্থাপিত হয় Pan African Congress, ক্রমশ সেই আলোড়নের ঢেউ আফ্রিকার মূল ভূখন্ডে আসে এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়। রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের চরিত্র ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হোত সেই দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ও শাসকগোষ্ঠীর

প্রতিক্রিয়া দ্বারা। ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশে সমগ্র আন্দোলন প্রায় অনুপস্থিত। পর্তুগালের স্বৈরাচারী শাসক ও উপনিবেশগুলির অগণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল বে-আইনী। তাই সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রাম হোল গোপনীয় এক ব্যাপার। তার চরিত্র হোল রক্তক্ষয়ী। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও সংগ্রাম হোল সশস্ত্র।

হীরে, সোনা এবং অন্যান্য মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতি আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সব চাইতে মজবুত। তার সাথে বাণিজ্য ও সেই দেশে লগ্নির প্রলোভন আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী কিছুতেই দমন করতে পারত না। ফ্রান্স ও জার্মানী সামরিক বিমান, আগ্নেয়াস্ত্র—সব কিছু বিক্রী করত দক্ষিণ আফ্রিকাকে। NATO-র সদস্য পর্তুগাল, Angola ও Mozambique-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে আফ্রিকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পাশে থেকে আন্তর্জাতিক সমাবেশ ও সংগঠনে নির্ভয়ে আফ্রিকার জনগণের আন্দোলনকে সমর্থন করেছে।

১৪.২ ইউরোপ ও আফ্রিকা

আফ্রিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন ১১,৬৯৩,০০০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা আশি কোটি। এই মহাদেশে এখন ৫৪টি স্বাধীন রাষ্ট্র আছে। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে আফ্রিকার উত্তরভাগের সঙ্গে দক্ষিণভাগের বিভিন্ন ব্যাপারে একটি পার্থক্য আছে। সাহারা মরুভূমির উত্তরে দেশগুলি সপ্তম শতাব্দী থেকে আরব সভ্যতা ও ইসলাম ধর্মের আওতায় আসে। সাহারার দক্ষিণের বিশাল অঞ্চল—যাকে বলা হয় Sub Saharan Africa-সেই প্রভাব থেকে প্রায় মুক্ত। আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্ম আফ্রিকার উত্তরের দেশগুলিকে মধ্যপ্রাচ্যের (Middle East) দেশগুলির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সেতু স্থাপন করেছে। তাই এইসব দেশের জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ইতিহাস আরব জাতীয়তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্ববর্তী এককে তার বিশেষ আলোচনা হয়েছে। তাই আফ্রিকা জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ইতিহাস আলোচনায় আমরা সাহারা মরুভূমির দক্ষিণদিকের দেশগুলির ঘটনাবলীতেই নিজেদের আবদ্ধ রাখব।

এশিয়া ও দক্ষিণ-আমেরিকার মত আফ্রিকার প্রায় সব দেশ ইতিহাসের এক বিশেষ যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্বাধীন ছিল। বিভিন্ন সময়ে পর্তুগাল, ইংলন্ড, ফ্রান্স, স্পেইন, বেলজিয়াম, ইতালী ও জার্মানী সাব-সাহারান আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

ইউরোপের শাসন থেকে মুক্ত হবার ইতিহাসই আফ্রিকার জাতীয়তার ইতিহাস। তাই আফ্রিকার মুক্তি যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও মূল চরিত্র বুঝতে হলে ইউরোপের সঙ্গে আফ্রিকার সম্পর্কের বিবর্তনের ইতিহাসের মূল কথাগুলি জানা দরকার।

ভূমধ্যসাগরের সান্নিধ্য উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে বহু পুরানো বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। লোহিত সাগরের (Red Sea) নিকটবর্তী পূর্ব আফ্রিকার ইথিওপিয়ার রাজবংশ ও জনগণের এক বিশেষ অংশ চতুর্থ শতাব্দী থেকেই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। তাই খ্রীষ্টান ইউরোপের ইথিওপিয়া সম্পর্কে এক ধরনের ঔৎসুক্য এবং বিচ্ছিন্নভাবে সংযোজন ছিল। সাহারার দক্ষিণের বাকী দেশগুলির সঙ্গে ইউরোপের বস্তুত কোন অভিজ্ঞতা বা সম্পর্ক ছিল না। সেই সম্পর্কের সূত্রপাত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন পর্তুগীজরা ১৮১৫

সালে মরক্কোর নিকটে অবস্থিত Centa শহর দখল করে এবং সেখান থেকে আট বছর ধরে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ঘেঁষে ধীরে ধীরে দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার অনেক নতুন অঞ্চল ইউরোপের নাবিক ও ব্যবসায়ীদের গোচরে আনে। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হয়। গোড়ার দিকে সেই বাণিজ্য পর্তুগালের ছিল একচেটিয়া আধিপত্য। পরে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী নাবিকরা সেই বাণিজ্যে যোগ দেয়।

ইউরোপ নিয়ে আসত কাপড় (যদিও এশিয়ার কোন দেশে তৈরী), লোহা ও অন্যান্য ধাতুর তৈরী সামগ্রী, বন্দুক, গোলা বারুদ, ব্রাণ্ডি, রাম, জিন ইত্যাদি মাদক দ্রব্য। আফ্রিকা থেকে ইউরোপ নিত সোনা, হাতির দাঁত, কাঠ, এক ধরনের আঠা, ভেজিটেবল তেল ইত্যাদি। কিছুদিন পর এই বাণিজ্যের চেহারা বদলে গেল। পণ্য হিসাবে সব চাইতে বেশী চাহিদা হল ভাল স্বাস্থ্যের আফ্রিকান যুবক যুবতীদের। অতলান্তিক সাগরের দুই পারের মধ্যে শুরু হল দাস ব্যবসা। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন উপনিবেশের চা, কফি, তুলা, আঁখ-এর খামারে ও খনিতে কাজের জন্য প্রচুর লোক দরকার হোত। ক্রীতদাস লাগালে মুনাফা অনেক বেশি হবে। তাই আফ্রিকা থেকে লক্ষ লক্ষ লোক ধরে নিয়ে বিক্রি করা হোত উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই ঘৃণ্য ব্যবসা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল দু'শ বছরের বেশী। আফ্রিকা হারিয়ে ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশী স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী যুবক ও যুবতী। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে ও শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে ক্রীতদাস কাজ করানো আর অতটা লাভজনক হোত না। ১৮০৩ সালে ডেনমার্ক ও ১৮০৭ সালে ইংলণ্ড এবং পরের বছর আমেরিকা দাস ব্যবসা বেআইনী ঘোষণা করে। ইউরোপের বাকী দেশগুলি ইংলণ্ড ও আমেরিকার পথ অনুসরণ করল। মানব ইতিহাসের অত্যন্ত ঘৃণ্য ও রক্তাক্ত এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হোল। ইউরোপের সঙ্গে আফ্রিকার বাণিজ্য কিন্তু বন্ধ হোল না। নতুন পণ্যের আবির্ভাব হোল। পাম গাছের তেল, পামের শাঁস, বাদাম এবং পরবর্তীকালে কোকো, কফি আফ্রিকার প্রধান রপ্তানীর সামগ্রী হিসাবে গৃহীত হোল।

ইউরোপের সঙ্গে আফ্রিকার বাণিজ্যের এই নতুন রূপ এক ধরনের রাজনৈতিক সমস্যা তৈরী করল। বাণিজ্যের প্রথা অনুযায়ী ইউরোপের ব্যবসায়ীরা অতলান্তিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর অথবা আরব সাগরের উপকূলের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছিল। আফ্রিকান দালালরা (Middlemen) ঘাঁটির নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে কাঁচামাল জোগাড় করে ইউরোপের ব্যবসায়ীদের ঘাঁটিতে এসে বিক্রি করত। অভ্যন্তরের শান্তি শৃঙ্খলার অভাব প্রায়ই মাল সরবরাহে অনিশ্চয়তা আনত। দালালের জন্য ইউরোপীয়দের মুনাফা একটু কমত। ইউরোপের ব্যবসায়ীরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন কোন ব্যবস্থার কথা ভাবতে শুরু করল। যদি ইউরোপের দেশগুলি নিজ নিজ প্রভাবাধীন অঞ্চলের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাহলে আইন শৃঙ্খলাজনিত সমস্যার সমাধান হবে এবং দালালদের ওপর নির্ভরশীলতাও কমবে। কেন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল—ঐতিহাসিকরা তার ব্যাখ্যা নানাভাবে করেছেন। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বাণিজ্যিক সুবিধাকে সুদৃঢ় করবে—তাই উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজন আছে—এই চিন্তাধারা ইউরোপকে আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে প্রভাবিত করেছে এই মতই আধুনিকতম গবেষণা সবচাইতে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকরা আগে থেকেই আফ্রিকার অভ্যন্তরে কাজ করছিলেন। তাঁরা মনে করতেন রাজনৈতিক ক্ষমতা ধর্ম প্রচারে এবং ইউরোপীয় ভাবধারা প্রবর্তনে অনেক সাহায্য করবে। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে পর্তুগাল, ইংলণ্ড, ফ্রান্স যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিল, আফ্রিকা দখলে আনলে সেই ক্ষমতা অটুট রাখতে সাহায্য করবে—

এই ধারণাও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তাই শুরু হোল আফ্রিকাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য ইউরোপীয়ানদের মধ্যে প্রতিযোগিতা—যা ইতিহাসে 'Scramble for Africa' নামে পরিচিত।

১৪.৩ আফ্রিকায় ইউরোপের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার

পর্তুগাল দখল করল দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় Angola ও Mozambique, পশ্চিম আফ্রিকার Portuguese Guinea এবং Cape Verde, Sao Tome ও Principe দ্বীপগুলি। স্পেইন অধিকার করল Morocco ও Manritania মধ্যবর্তী Spanish Sahara, Fernando Po এবং Rio Muni দ্বীপ যা এখন যুক্তভাবে Republic of Equatorial Guine নামে পরিচিত। Morocco এর কাছে Ifri নামে ছোট্ট একটি দ্বীপও স্পেইন-এর অধিকারে আসে। ইংলণ্ডের অধিকারে আসে পশ্চিম আফ্রিকায় The Gambic, Gold Coast (এখন Ghana নামে পরিচিত), Nigeria ও Sierra Leone। পূর্ব আফ্রিকায় Kenya, Uganda Malawi, দক্ষিণ আফ্রিকায় South ও North Rhodisia। দক্ষিণ রোডেসিয়ার বর্তমান নাম Zimbabwe এবং উত্তর রোডেসিয়া বর্তমানে Zambia নামে পরিচিত। Bolswara, Lesotho, Swajiland (পুরোনো নাম Bechuanaland, Basuloland, Swaziland-এর নামের কোন পরিবর্তন হয় নি) প্রশাসকি দায়িত্বও পরোক্ষভাবে ইংরেজদের কাছেই এল। আরও দক্ষিণে যেটা তখন Republic of South Africa। সেখানে বসবাসকারী ইংরেজরা আগে থেকে আসা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যাপারে এক ধরনের বোঝাপড়া করে নিল। ফ্রান্স পেল বিশাল এক সাম্রাজ্য। পশ্চিমে ছিল Cameroon, Dahomey, Guinea, Ivory Coast, Senegal ও Upper Volta (যার বর্তমান নাম 'Barkina Faso')। । মধ্য আফ্রিকায় Conge (Parzzaville), Gabon ও Central African Republic জার্মানির অধিকারে এল South West Africa (বর্তমান নাম Namibia), মধ্য আফ্রিকায় Rwanda ও Busundi, পশ্চিম আফ্রিকায় Tago এবং পূর্ব আফ্রিকায় Tanganyika। বেলজিয়াম এবং রাজা King Leopold ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে Congo (বর্তমান নাম Zaire)-এর ওপর শাসন চালাত। ১৯০৮ সালে Congo, Belgium এর উপনিবেশে পরিণত হোল। ইতালি পেল পূর্ব আফ্রিকার Somalia এবং Eritoca। সাব সাহারান আফ্রিকার পশ্চিমে সইবেরিয়া ও পূর্বে ইথিওপিয়া বাদে সমস্ত অঞ্চল ইউরোপীয়ানদের দখলে আসে। লাইবেরিয়া তৈরী হয়েছিল আমেরিকার সরকার ও American Colonization Society-র যৌথ প্রচেষ্টায়। আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসদের সন্তান সন্ততীর মধ্যে যারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে, তাদের আফ্রিকায় ফিরিয়ে নতুন জীবন যাপনের সুযোগ দেবার জন্যই মার্কিন সরকার ১৮২২ সালে লাইবেরিয়াতে একটি 'settlement' স্থাপন করে। ১৮৪৭ সালে লাইবেরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। আমেরিকার ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা লাইবেরিয়ার সার্বভৌমত্ব ইংলণ্ড ফ্রান্স বা অন্য কোন ইউরোপীয় দেশ কেড়ে নিতে সাহস পায় নি। ইথিওপিয়া অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশ। পাশের দেশ সোমালিল্যাণ্ড ও ইরিটিয়া ছিল ইতালির দখলে। ইতালি চেষ্টা করল ইথিওপিয়াতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তার করতে। কিন্তু ১৮৯৬ সালে অ্যাডোয়ার যুদ্ধে (Battle of Adowa) ইথিওপিয়ার সম্রাট মেনেলিক ইতালীকে পরাস্ত করেন। তাই ইথিওপিয়া তার স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা বজায় রাখতে পারছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মুসোলিনীর আমলে ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪১ সাল অবধি পাঁচ বছর ইথিওপিয়া কখনও স্বাধীনতা হারায় নি।

আফ্রিকাকে টুকরো টুকরো করে ভাগ নিয়ে নেবার এই জঘন্য কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে রাজনৈতিক

গুণ্ডাবাজির এক নিকৃষ্ট উদাহরণ। স্বাভাবিক কারণে, কে কতটা নেবে তা নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে কিছু রক্তক্ষয় ও মন কষাকষি হয়। তা মেটাবার জন্য ১৮৮৪-৮৫ সালে বার্লিনে এক অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে আফ্রিকার জমি বন্টনকে আন্তর্জাতিক অনুমোদন দেওয়া হয়। বার্লিনের সেই সমাবেশে সুইজারল্যাণ্ড বাদে ইউরোপের সব দেশ উপস্থিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও উপস্থিত ছিল। কিন্তু আফ্রিকার কোন প্রতিনিধি ছিল না। Colonial Africa-র একটি রঙ্গীন ম্যাপ—রং এর মাধ্যমে ইউরোপের কোন দেশ কোথায় রাজত্ব করছে, সেটা দেখিয়ে দেওয়া—এখানে প্রয়োজন।

১৪.৪ কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাস মানে ইউরোপ অধিকৃত আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস। বিষয়টির ব্যাপ্তি বিশাল এবং চরিত্র জটিল। কারণ আমরা কোন একটি বিশেষ দেশের কথা বলছি না—বলছি প্রায় গোটা একটি মহাদেশ নিয়ে। সেখানে আছে অনেকগুলি দেশ যাদের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করছে ইউরোপের অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটা প্রশাসনিক নীতি ছিল। তাই আফ্রিকানদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং মুক্তি সংগ্রাম আলাদা রূপ নিয়েছে।

পৃথিবীর অনেক দেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের আগে সাহিত্য ও চিন্তার জগতে এক ধরনের আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়। এক অর্থে আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামেও এই ধরনের এক আলোড়ন দেখা যায়। তবে সেটা আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডে শুরু হয়নি, হয়েছিল 'বৃহত্তর আফ্রিকা'য়—অর্থাৎ African diaspora তে। নিগ্রোজাতির অনেকে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করতেন—তাদের মধ্যে। কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে গর্বের সঙ্গে সেটা ঘোষণা করতে শুরু করল। তীক্ষ্ণধী কৃষ্ণাঙ্গ চিন্তাবিদ Edward Wilmot Blyden আফ্রিকার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব (African personality) সম্পর্কে লিখলেন। পরে নিগ্রোজাতির নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করা হোল 'Negritude' ধারণার মাধ্যমে। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ কবি Langston Hughes লিখলেন—

'I am a Negro
Black as the night is black
Black like the depths of my Africa'

সেনেগালের কবি David Diop লিখলেন

'Suffer poor Negro
Negro 'black like grief'

আফ্রিকার সঙ্গে আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কৃষ্ণাঙ্গদের একাত্মতা জোর গলায় ঘোষিত হোল। Langston Hughes লিখলেন।

We are related you and I
You from West Indies
I from kentucky.

We are related you and I
You from Africa
I from the states
We are brothers—you and I.

দাস ব্যবসা ও দাসত্বের অত্যাচারের সব চাইতে বড় শিকার কৃষ্ণকায়রা এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগত। কালো গায়ের রং-এর সঙ্গে পরাজয় ও গ্লানির এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আফ্রিকানদের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করেছিল। কৃষ্ণকায়দের সাহিত্য সেই মনোভাব থেকে নিজেদের মুক্তির প্রচেষ্টার প্রতিফলন। সেনেগালের কবি Leopold Senghor যিনি পরে স্বাধীন সেনেগালের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিল। তিনি লিখলেন

'Woman mide, woman black
Clad in your colour which is life
Your beauty strickes me to the heart
As lighting strikes the eagle'.

সাহিত্য ও চিন্তায় প্রতিফলিত এই চেতনা কিছু দিনের মধ্যে এক কৃষ্ণাঙ্গ সংগঠন প্রতিষ্ঠায় রূপ নিল। Pan African Congress-এর জন্ম হোল। প্রথম অধিবেশন হয়েছিল London-এ ১৯০০ সালে। তারপর প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে নিয়মিতভাবে এই সংগঠনের অধিবেশন বসত ইউরোপের বিভিন্ন শহরে। প্রথম দিকে আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ন আইল্যাণ্ডের কৃষ্ণাঙ্গ চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা এই সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন। পরে আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড থেকে উচ্চশিক্ষিত ও মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী অনেক নেতা যোগ দিলেন। কিনিয়ার Jomo Kenyatta, গোল্ড কোষ্টের Kwame Nkrumah, ট্যাঙ্গানিকার Julius Nyerere, নাইজেরিয়ার Nnamdi Azikiwe এবং আরও অনেকে চল্লিশের দশকের প্যান আফ্রিকান কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

১৪.৫ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু

কৃষ্ণাঙ্গ বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়করা যখন নিগ্রোজাতির পৃথক সত্তা ও অনন্যতা ব্যাখ্যায় মুখর তখন মূল ভুখণ্ডেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে এসেছিল অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন, কাঁচামাল বিদেশে পাঠাবার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট ও যানবাহন, পশ্চিমি শিক্ষা ব্যবস্থা, খ্রীষ্টান ধর্ম, নগরের পত্তন হয়েছিল এবং নাগরিক জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে এসেছিল নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারা। পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত আফ্রিকানদের গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা এই সব ধারণা, ইউরোপে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণ ও নাগরিক জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে অনেক খবর ভয়ানক ভাবে আকৃষ্ট করল। ইউরোপের দেশগুলির এই চালচিত্রের পাশে দেখল নিজেদের দেশের করুণ অবস্থা। দারিদ্র, কুসংস্কার, অশিক্ষা, বর্ণবৈষম্য ও অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা—এই চিত্র বড়ই পীড়াদায়ক। 'পরাধীনতাই এই সবের মূল'—

শিক্ষিত আফ্রিকানদের এটা ছিল বদ্ধমূল ধারণা। "Seek Ye First the Political Kingdom" গোল্ডকোস্টের নেতা Kwame Nkrumah-এর এই শ্লোগান অতি সহজেই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত

ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করল। শিক্ষকতা, ওকালতি, ডাক্তারি এই সব পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেশার ভিত্তিতে গঠিত সংগঠনগুলি দেশের ও সাধারণ দেশবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা ও ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকৃত রূপ কি—এই সব আলোচনার প্রধান মঞ্চে পরিণত হোল। বলা হয় কোলকাতার হাইকোর্টের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল। নাইজেরিয়া, গোল্ডকোস্ট, কিনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আফ্রিকার আরও অনেক দেশের আইনজীবীরাই নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন।

সব জাতীয় আন্দোলন এক অর্থে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন। আফ্রিকার সব দেশেই ঔপনিবেশিক সরকারের শিল্প-বাণিজ্যিক নীতি ও দেশের লোকদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার অভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাতীয় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ইউরোপীয় শাসনের ফলে সব দেশেই খনিজ সম্পদের বাণিজ্যিক প্রয়োগ শুরু হয়েছিল। সেই সম্পদের ভিত্তিতে কিছু মাঝারি ধরনের শিল্পও প্রায় সব দেশেই স্থাপিত হয়েছিল। ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশগুলিতে বেশ কিছু বেতনভোগী শ্রমিক (Wage-earner) তৈরী হয়েছিল। ফরাসী অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে এদের সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন লক্ষ। ইংরেজ কলোনী নাইজেরিয়ায় পাঁচ লক্ষ, গোল্ডকোষ্টে দুই লক্ষ, কিনিয়ায় সাড়ে চার লক্ষ, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেসিয়ায় প্রায় আট লক্ষ। স্বভাবতই কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক সংগঠন (Trade Union) তৈরী হোল। কিছুদিনের মধ্যেই মালিকদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করার জন্য অথবা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ জানাবার জন্য শ্রমিক সংগঠনগুলি ধর্মঘটকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করল।

অর্থনৈতিক দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম এর এই হাওয়া গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। কৃষকরা পণ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর অধিকতর মূল্য ও বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারী সাহায্যের জন্য আন্দোলন করতে শিখল। আফ্রিকার বহু দেশেই বাণিজ্যের বিভিন্ন স্তরে ইউরোপের মধ্যপ্রাচ্যের—বিশেষ করে লেবানন ও সিরিয়ার—লোকেরা ও ভারতীয়রা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। স্থানীয় লোকেরা চাইল দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। ব্যবসায়ে স্থানীয় লোকদের বৃহত্তর ভূমিকার দাবী স্বভাবতই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।

ধর্মীয় সংগঠনগুলিও বিভিন্নভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল। সাব-সাহারান আফ্রিকায় খ্রীষ্টানধর্ম, ইসলাম ও চিরাচরিত আফ্রিকার ধর্মীয় বিশ্বাস—এই তিন ধারা একই সঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ও ইউরোপীয় কৃষ্ণাঙ্গ মিশনারীদের প্রচেষ্টার ফলে অনেক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী আফ্রিকান খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পশ্চিমি আদব কায়দার মোড়কে ঢাকা খ্রীষ্টান চার্চের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নানান প্রশ্ন তুললেন। ফলে বেশ কয়েকটি আফ্রিকান চার্চ প্রতিষ্ঠিত হোল। আমেরিকার বিখ্যাত কৃষ্ণকায় নেতা Marcus Garvey প্রতিষ্ঠা করেছিলেন African Orthodox Church। মার্কাস গার্ভের যুক্তি ছিল যীশু এশিয়ার সন্তান। ইউরোপীয়রা নিজেদের গায়ের রং-এর সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে ও মেরী মাতাকে শ্বেতকায় হিসাবে বিশ্বময় প্রচার করেছে। কৃষ্ণকায় আফ্রিকানরা কেন যীশুকে ও মেরী মাতাকে কৃষ্ণকায় হিসাবে দেখবে না? মার্কাস গার্ভের চার্চ Black Madonna-কে পূজা করত। তারই অনুকরণে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হোল Ternfu Church, নাইজেরিয়ায় United Native African Church এবং পশ্চিম আফ্রিকার লাইবেরিয়া ও আইভরিকোষ্টে Prophet Harris Church, হ্যারিস জন্মেছিলেন

লাইবেরিয়াতে। তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে আফ্রিকান রীতি নীতি মিশিয়ে ধর্মপ্রচারে ব্যাপৃত হন। তাঁর প্রভাবে সাধারণ আফ্রিকানদের এক বিরাট অংশ Prophet Harris Church-এ যোগ দেয়।

আফ্রিকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ছোঁয়া লাগান এই খ্রীষ্টানধর্মকে এক কথায় বলা যায় 'Syncretic Christianity'—সংকর খ্রীষ্টানধর্ম। বহুপত্নী বিবাহ, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ কর্তন (Circumcision)—যে প্রথা মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত, আফ্রিকার চিরাচরিত চিকিৎসা পদ্ধতি—এই সব কিছুই নতুন চার্চগুলির অনুমোদন পেয়েছিল। রবিবারে গীর্জার সমাবেশে নতুন চার্চগুলি আফ্রিকান বাদ্যযন্ত্র ও আফ্রিকান নৃত্য সহ ধর্ম সঙ্গীত পরিবেশন করত। ইউরোপ থেকে আসা পাদ্রীদের প্রবর্তিত ধর্মচর্চার পদ্ধতিকে বাতিল করে আফ্রিকার নিজস্ব এক রীতিকে প্রবর্তন করে ধর্মজগতে এক বিশেষ আলোড়ন আনলেন আফ্রিকার ধর্মযাজকরা। এই আলোড়ন আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ভীষণভাবে সমৃদ্ধ করেছিল। জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিণতি রাজনৈতিক দল গঠন ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন। আফ্রিকার সব চাইতে জনবহুল দেশ নাইজিরিয়ায় তৈরী হোল বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল। National Council of Nigerian Citizens (NCNC), Action Party, Northern People's Congress (NPC) ছিল নাইজেরিয়ার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দল। গোল্ডকোষ্টে ছিল Convention People's party (CPP) ও United Gold Coast Convention (UGCC), কিনিয়ায় তৈরী হল Kenya African Union (KAU) এবং সিয়েরা লিয়নে Sierra Leone People's Party (SLPP) ফরাসী উপনিবেশ সেনেগালে তৈরী হয়েছিল Union Progressive Senegalaise (UPS) এবং Parti du Regronpement African (PRA) এবং আইভরি কোষ্টে Rassemblement Democratique African (RDA)।

সব দেশেই রাজনৈতিক দল তৈরী হয়েছিল। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি দলের নাম উল্লেখ করা হোল। আফ্রিকানদের জন্য অধিকতর সুযোগ সুবিধা, বর্ণভিত্তিক বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সার্বিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের দাবী—সব রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীর মূল অঙ্গ ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে। মিত্রপক্ষ এই যুদ্ধকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যুদ্ধ হিসাবে দেখত এবং সেইভাবে প্রচার করত। ১৯৪১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট Franklin Roosevelt এবং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী Winston Churchill আটলান্টিক মহাসাগরে এক জাহাজে বসে তৈরী করলেন 'Atlantic Charter'। এই সনদে ৮টি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তৃতীয় বিষয়টি ছিল "They respect the rights of all to choose the form of government under which they live"। আটলান্টিক চার্টার আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মুক্তি আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। স্বাধীনতার আন্দোলনে আফ্রিকার নেতারা বার বার আটলান্টিক চার্টারের এই ঘোষণা উদ্ধৃত করতেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 'বৃহত্তর আফ্রিকা'র কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে Pan African Congress সংগঠিত হয়েছিল এবং সেই সংস্থা ১৯০১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে অধিবেশন করত। ১৯৪৫ সালে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে Pan African Congress-এর এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় "We demand for Black Africa autonomy and independence, so far and no further, that it is possible in this one World for groups and peoples to rule themsleves subject to inevitable world unity

and federation ... We are determined to be free." জোর গলায় আফ্রিকার নেতারা তাদের লক্ষ্য ঘোষণা করলেন—স্বাধীনতা তাদের চাই এবং কয়েক বছরের মধ্যে তারা স্বাধীনতা পেলেন।

১৪.৬ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ ইংরাজ শাসিত অঞ্চল

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সবার আগে বেরিয়ে আসে পশ্চিম আফ্রিকার ইংরেজ শাসিত গোল্ডকোষ্ট। ১৯৫৬ সালে গোল্ডকোষ্টে সাধারণ নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে UGCC দল থেকে বেরিয়ে আসা চরমপন্থীদের নেতা Kwame Nkrumah-র CPP ১০৪টি আসনের ৭২টি আসন পেল জাতীয় সংসদে। ঐতিহ্যমণ্ডিত আশান্তি সাম্রাজ্যের রাজধানী Kumasi-তে তৈরী National Liberation Movement (NLM) ঐ অঞ্চলে এবং উত্তরের রাজনৈতিক দল Northern People's Party (NPP) উত্তরাঞ্চলে ভাল করলেও কোয়ামি নক্রুমার দলকে আটকাতে পারল না। ১৯৫৭ সালের ৬ মার্চ গোল্ডকোষ্ট স্বাধীন হোল। প্রায় এক হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা সাম্রাজ্যের স্মৃতিকে পৃথিবীর কাছে নতুন করে তুলে ধরার জন্য নক্রুমা গোল্ডকোষ্টের নতুন নাম দিলেন ঘানা।

Harold Mcmillan ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন একটি ভাষণে বলেছিলেন আফ্রিকায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। ১৯৬০ সালে বেশ কয়েকটি ইংরেজ কলোনীকে স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে ম্যাক্‌মিলান বুঝিয়েদিলেন তিনি কি বলতে চাইছিলেন। আফ্রিকার সবচাইতে জনবহুল দেশ নাইজেরিয়া স্বাধীন হয় ১৯৬০ সালের পয়লা অক্টোবর। নাইজেরিয়ার রাজধানীতে ধর্ম ও আঞ্চলিকতা এই দুয়ের প্রচুর প্রভাব। উত্তরে Hausa ও Fulani দের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্মের প্রচণ্ড প্রভাব। পশ্চিমে Yoruba-দের আর পূর্বে Ibo দের আধিপত্য। পূর্ব ও পশ্চিমে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী অনেক যদিও আফ্রিকার চিরাচরিত ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যাও কম নয়। উত্তরের রাজনৈতিক দল Northern People's Congress-এর নেতা Alhaji Abubakar Tafewa Belewa ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের অবিসংবাদী নেতা। Yoruba-দের চালাতেন Action Party-র নেতা Chief Awaolowo। Dr. Nnamdi Azikiwe (যিনি 'ZIK' নামে পরিচিত) ছিলেন NCNC রাজনৈতিক দলের নেতা। ZIK ছিলেন Ibo কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দলের আদর্শ আঞ্চলিক ছিল না। তাই ব্যক্তি হিসাবে Dr. Azikiwe ছিলেন প্রায় সর্বজন গ্রাহ্য। ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা পাবার পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন উত্তরের নেতা Tafewe Balewa। ১৯৬৩ সালে নতুন সংবিধান তৈরী হোল এবং নাইজেরিয়া একটি Federation বা যুক্তরাজ্য হিসাবে ঘোষিত হোল। Dr. Azikiwe হলেন যুক্তরাজ্যের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং Balewa প্রধানমন্ত্রীর পদে আবার অভিষিক্ত হলেন।

পশ্চিম আফ্রিকার Sierra Leone স্বাধীন হয় ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে, Gambia ১৯৬৩ সালে স্বায়ত্বশাসন ও ১৯৬৫ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা পায়।

পূর্ব আফ্রিকায় ইংরেজ প্রভাবাধীন Uganda স্বাধীনতা পায় ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে। একই বছর এপ্রিল মাসে উগাণ্ডায় সাধারণ নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে Uganda People's Congress (UPC) Dr. Milton Obote-র নেতৃত্বে সব চাইতে বেশী সংখ্যক আসন জেতে কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় আর একটি দলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সরকার গঠন করে। ডাঃ ও বোটি স্বাধীন উগান্ডার প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

Malawi মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত। আগেকার নাম Nyasaland। ইংরেজ আমলে Malawai ছিল Federation of Rhodesia and Nyasaland এর অংশ। ১৯৬৩ সালে সেই Federation ভেঙে যায়। একই বছর Malawai স্বায়ত্বশাসনের অধিকার পায়। পরের বছর পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। Malawi Congress Party-র নেতা Dr. Hastings Banda হন স্বাধীন Malawi-র প্রথম প্রধানমন্ত্রী। Zambia-র আগের নাম ছিল Northern Rhodesia। Zambia Federation of Rhodesia and Nyasaland এর অংশ ছিল। ফেডারেশন ভেঙ্গে যাবার পর নতুন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হোল ১৯৬৪ সালে। সেই নির্বাচন United National Independence Party (UNIP) জয়ী হয় এবং একই বছর UNIP-র নেতা Kenneth Kaunda স্বাধীন Zambia-র প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে Bechuanaland, Swaziland এবং Basutoland নামে তিনটি High Commission Territory ছিল। এগুলি ছিল ইংরেজ সরকারের 'protected' রাজ্য। স্থানীয় রাজবংশের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে ইংরেজ সরকার এদের শাসন করত। বেচুয়ানাল্যান্ডের বর্তমান নাম Botswana। বটসওয়ানা স্বাধীনতা পায় ১৯৬৬ সালে। ১৯৬৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে Bechuanaland Democratic Party জাতীয় সংসদের ৩১টি আসনের মধ্যে ২৮টি অধিকার করে এবং BDP-র নেতা Seretse Khama Botswana-র প্রথম প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। Swziland-এর রাজা Sobhuza II দেশের রাজনৈতিক বিবর্তনে এক বিরাট অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই দল Imbokodvo Nationalist Movement ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়। রাজা, Senate এবং পুরোপুরি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত আইনসভা দেশের শাসনের দায়িত্বে আছে। নির্বাচনের পর রাজকুমার Makhosimi Dhlamini স্বাধীন Swaziland-এর প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। শাসনের এক বিরাট দায়িত্ব অবশ্য রাজার হাতেই থেকে যায়। Swaziland পূর্ণ স্বাধীনতা পায় ১৯৬৮ সালে। Basutoland-এর বর্তমান নাম Lesotho চারদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা দিয়ে ঘেরা এই দেশের শাসন ব্যবস্থা Swaziland-এর মত। রাজা Moshoeshoe II রাজনৈতিক শক্তির উৎস—শাসনে সাহায্যের জন্য আছে সেনেট ও জাতীয় আইনসভা। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে Basutoland National Party (BNP) জয়ী হন এবং তার নেতা Leabua Jonathan দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। Lesotho পূর্ণ স্বাধীনতা পায় ১৯৬৬ সালে।

১৪.৭ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ ফরাসী দেশ শাসিত অঞ্চল

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে আফ্রিকার উপনিবেশ প্রশাসন নীতিতে বিরাট পার্থক্য ছিল। ইংলণ্ড Lord Lugasd-এর প্রবর্তিত 'Indirect Rule' এর নীতি অনুসরণ করত। ইংরেজ শাসিত দেশগুলির বিভিন্ন Tribe-এর প্রধান বা Chief-দের পুরোপুরি ক্ষমতাচ্যুত না করে তাদের মাধ্যমে শাসন-ই ছিল ইংরেজ শাসনের বৈশিষ্ট্য। সেই প্রধানদের ওপর কড়া নজরদারী চলত এবং বেয়াদপি করলে প্রচণ্ড সাজা দেবার ব্যবস্থা হোত। কিন্তু 'পরোক্ষ শাসনের' জন্য আফ্রিকানদের পুরানো জীবনযাত্রা অথবা দৈনন্দিন শাসনে বিদেশী হাত চোখে পরত না।

ফরাসীরা উপনিবেশ শাসনে অন্য নীতিতে বিশ্বাস করত। ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতি ছড়াতে হবে এবং তার মাধ্যমে আফ্রিকানরা হবে কৃষ্মকায় ফরাসী। কৃষ্মকায় ফরাসীদের ধ্যান ধারণা হবে প্যারিস যাওয়া এবং

প্রায় শ্বেতকায় ফরাসী হওয়া। আফ্রিকানদের মধ্যে এই মনোভাবের বিস্তার হলে ফরাসী উপনিবেশে কখনো ভাঙন ধরবে না—এটা ছিল প্যারিসের শাসককুলের দৃঢ় বিশ্বাস।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী উপনিবেশের কোন কোন নেতা হিটলারের ফ্রান্স অধিকারের বিপক্ষে ছিলেন। কেউ কেউ প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত হিটলারের তাঁবেদার গোষ্ঠির সমর্থক ছিলেন। নাৎসী অধিকারের বিরুদ্ধে সব চাইতে বড় প্রবক্তা Charles de Gaulle ঠিক করলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের উচিত নতুন এক আফ্রিকা নীতি গ্রহণ করা। তাই ১৯৪৪ সালে ফরাসী কঙ্গোর রাজধানী Brazzarille-এ এক অধিবেশন ডাকলেন। ফ্রান্স ও আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ—এরা এক এবং অবিচ্ছেদ্য—সব ফরাসীদের মত de Gaulle-ও সেই মতে বিশ্বাস করতেন। তবে তিনি টের পেয়েছিলেন যে আফ্রিকায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে এবং শিক্ষিত আফ্রিকানদের বিরাট একটা অংশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। তাঁদের ইচ্ছা একেবারে অগ্রাহ্য করা মূর্খতা হবে। তাই Brazzaville অধিবেশনে তিনি বললেন যে যুদ্ধ পরবর্তী ফরাসী সংবিধান তৈরীর কাজে আফ্রিকার প্রতিনিধিরা প্যারিসের সমস্ত বৈঠকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। ঠিক হোল আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে 'আঞ্চলিক বিধান সভা' গঠিত হবে এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। ১৯৫৬ সালে ফরাসী সংসদ Loi Cadre পাশ করল। এই আইন আফ্রিকার আঞ্চলিক বিধানসভাগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও কার্য নির্বাহের ক্ষমতা দিল। সেই ক্ষমতা বিভাজন কিভাবে হবে তা নিয়ে আফ্রিকার নেতাদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিল। গিনির নেতা Sekou Touri মনে করতেন সব দেশে বিধানসভা না করে দুটো বৃহত্তর 'Federal type' বিধানসভা করা উচিত। একটা হবে সমস্ত পশ্চিম আফ্রিকার জন্য—যাতে থাকবে Cameraoun, Dahonuy, Guinea, Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo এবং Uper Vocta। আর একটা হবে Frenh Equatorial Africa-র জন্য। যাতে (Brazzaville) থাকবে Central African Republic, Congo (Brazzaville) (Gabon এবং Tehad Nkwame Nkrumah এর মত Sekou Touri আফ্রিকার ঐক্যে বিশ্বাস করতেন। তাই আফ্রিকার Balkanization বা অতিখন্ডন তিনি পছন্দ করতেন। Ivory Coast-এর নেতা Felix Honphonet-Boigney অপরদিকে মনে করতেন সব কটি দেশে আঞ্চলিক বিধানসভা হওয়া উচিত।

১৯৫৮ সালে de Gaulle-এর নেতৃত্ব ফ্রান্স যে সংবিধান গ্রহণ করল সেই সংবিধান 'ফ্রান্স এবং আফ্রিকায় ফ্রান্সের উপনিবেশ এক এবং অবিচ্ছেদ্য' এই বিশ্বাসকে চিরতরে বিসর্জন দিল। ঠিক হোল প্রতিটি দেশেই আঞ্চলিক বিধানসভা থাকবে এবং সমস্ত ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকার দেশ ও ফ্রান্স মিলে একটা 'Communane' তৈরী হবে। কম্যুনিটির সদস্যরা সবাই পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে, কিন্তু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারের মূল নীতি নির্ধারণ করবেন কম্যুনিটির মন্ত্রীরা অর্থাৎ প্যারিসের ফরাসীরা। মাঝে মাঝেই সব সদস্যদের প্রধানমন্ত্রীরা বৈঠকে বসবেন—সেই বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি de Gaulle।

সেই বছরই সেপ্টেম্বর মাসে সব দেখে ভোট হলে এই ব্যবস্থা তারা চায় কি না নির্ধারণ করার জন্য। যারা চাইবে না তাদের দেওয়া হবে তাৎক্ষণিক পূর্ণ স্বাধীনতা। আর যারা চাইবে তারা কম্যুনিটির সদস্য হিসাবে ফ্রান্সের সংগে যোগ রেখে কোন কোন মৌলিক ব্যাপারে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব স্বীকার করে এক ধরণের স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করবে। Sekou Touri-এর নেতৃত্বে গিনি পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিল। বাকী সব দেশ ঠিক করল তার কম্যুনিটির সদস্য হিসাবে থাকবে। গিনি ১৯৫৮ সালে স্বাধীনতা পেল। Parti Democratique

de Guinee (PDG)-র নেতা Sekou Touri শাসনভার গ্রহণ করলেন এবং de Gaulle-এর বিরোধিতা করায় ফ্রান্সের বিরাগ ভাজন হলেন। ফ্রান্স রাতারাতি গিনি থেকে সব রকম সাহায্য, লোকজন তুলে নিল। ঔপনিবেশিকতার কদর্য এক ভাবমূর্তির আক্রমণাত্মক প্রকাশের শিকার হোল গিনি।

Ivory Caost-এর নেতা ছিলেন Felix Houphonet Boigney। তাঁর নিজের দল ছিল Parti Democratique Cote d'ivoire এবং তিনি ফরাসী ভাষাভাষী আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক কাজ করার জন্য তৈরী Rassemblement Democratique African (RDA) দলের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। de Gaulle-এর ১৯৫৮ সালের প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় Ivory Coast 'Communante' এর সদস্য হিসাবে ছিল কয়েক বছর। ১৯৬০ সালে de Gaulle সেই ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে আফ্রিকার সমস্ত ফরাসী উপনিবেশগুলিকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন। Houphonet Boigney-কে রাষ্ট্রপতি করে Ivory Coast স্বাধীন হোল।

Senegal-এর রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাস Ivory Coast-এর মত সেনেগাল ১৯৫৮ সালে de Gaulle-এর প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল। সেনেগালে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল বেশী। মূল দল ছিল Union Progressiste Segegalaijse (UPS) যার নেতা বিখ্যাত কবি ও বুদ্ধিজীবী Leopold Senghor। তাছাড়া ছিল Parti due Regrupment African (PRA) এবং Parti African de I'Inedependance (PAI)। PAI প্রায় কম্যুনিষ্ট উগ্রপন্থী দল হিসাবে পরিচিত। ১৯৫৮ সালে de Gaulle-এর প্রস্তাবে বিরোধিতা করে PAI ফ্রান্সের বিরাগভাজন হয় এবং ১৯৫৯ সালে বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়। Senegal ১৯৬০ সালে স্বাধীন হয় এবং স্বাধীন সেনেগালের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন Leopold Senghor।

Upper Volta (বর্তমান নাম Burkisa Faso)-র প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল ছিল RDA-র স্থানীয় সংস্থা Union De'moaratique Voltcque. UDV-র নেতা Maurice Yameogo ছিলেন Upper Volta-এর প্রথম রাষ্ট্রপতি। Upper Volta ১৯৬০ সালে স্বাধীন হয় Dahomey (বর্তমান নাম Benin) একই সময় স্বাধীন হয়। Hubert Maga হন প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং MSM Apithy হন প্রথম রাষ্ট্রপতি।

French Equatorial Africa-র সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দেশ ফরাসী Congo যাকে বেলজিয়াম অধিকৃত Congo-র থেকে পৃথক করার জন্য দেশের রাজধানীর নাম যোগ করে Congo (brazzaville) বলা হয়। Brazzaville ছিল সমস্ত French Equatorial Africa-র কেন্দ্রবিন্দু। এই শহরেই de Gaulle তাঁর ঐতিহাসিক অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। Congo স্বাধীন হয় ১৯৫০ সালে। RDA-র স্থানীয় রাজনৈতিক Union Democratique de Defense de Intirets Africans (UDDAI) ছিল Congo-র সব চাইতে প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল। Congo-র প্রথম রাষ্ট্রপতি UDDAI-র নেতা Abbe Fulbort Youlon। Gabon আফ্রিকা ছোট দেশগুলির মধ্যে সব চাইতে সমৃদ্ধিশালী। Gabon-এ RDA-র আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংস্থা Bloc Democratique Gabonais (BDG) সব চাইতে প্রভাবশালী দল। ১৯৬০ সালে স্বাধীনতার পর Leon Mba হল Gabon-এর প্রথম রাষ্ট্রপতি। তেল ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ Gobon-কে আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকে পৃথক করেছে।

১৪.৮ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ পর্তুগাল শাসিত অঞ্চল

আফ্রিকায় পর্তুগালের বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। সেই সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ৮ লক্ষ বর্গমাইল—পর্তুগালের আয়তনের কুড়ি গুণেরও বেশী। আগেই বলা হয়েছে সেই সাম্রাজ্যে ছিল মূল ভূখন্ডের Angola, Mazambique ও Portuguese Guine এবং Cape Verde, Sao Thome and Principe দ্বীপগুলি। পর্তুগাল পশ্চিম ইউরোপের সব চাইতে দরিদ্র দেশ। পর্তুগালের স্বাক্ষরতার হার ইউরোপে সব চাইতে কম। তাই পর্তুগালের সরকার যে নিজের দেশকেই সমৃদ্ধ করতে পারেনি—সে উপনিবেশকে সমৃদ্ধ করবে এটা আশা করাই ভুল। কিন্তু আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও পর্তুগাল ৫০০ বছরেরও বেশী আফ্রিকায় ছিল এবং গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করত যে পর্তুগাল আরও ৫০০ বছর আফ্রিকায় থাকবে। এই ধরনের লড়াই-এর ভিত্তি কি তা জানতে হলে পর্তুগালের ঔপনিবেশিক নীতির মূল কথাগুলি জানা দরকার।

পর্তুগাল মনে করত সাগরপারের উপনিবেশগুলি আসলে পর্তুগালের অচ্ছেদ্য অংশ। ওগুলি উপনিবেশ নয়। তাই তাদের স্বাধীনতা দেবার কথা অবান্তর। দ্বিতীয়ত পর্তুগাল উপনিবেশগুলিতে সরকারি কোন শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেনি। সমস্ত বিদ্যালয়—অধিকাংশই প্রাথমিক স্তরের-ক্যাথলিক চার্চের অধীনে ছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রীরাই শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করত। সরকার কিছু অনুদান দিত মাত্র। পাদ্রীদের অধীনে থাকায় শিক্ষার চাইতে ধর্মপ্রচার অনেক বেশি হোত। অনেক উপনিবেশে অর্ধেকের বেশি আফ্রিকান খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। ধর্মান্তরের এত উঁচু হার অন্য কোন উপনিবেশে দেখা যায় না। তৃতীয়ত পর্তুগাল আফ্রিকার উপনিবেশ forced labour বা 'প্রায় দাসপ্রথা' নিয়মিত ব্যবহার করত। আফ্রিকান শ্রমিকদের ওপর শারীরিক অত্যাচারের ঘটনাও বিরল ছিল না। চতুর্থতঃ ইংরেজ ও ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকা যখন স্বাধীনতা পেল স্বভাবতই পর্তুগালের উপনিবেশগুলিতে তার ঢেউ লাগল। স্বাধীনতা সংগ্রাম সেখানেও শুরু হলো এবং সেই সংগ্রাম দমন করতে প্রায় দেড় লক্ষ পর্তুগীজ সৈন্য আফ্রিকায় মোতায়েন করা হোল। সামরিক খাতে এই ব্যয় পর্তুগালের জাতীয় বাজেটের ৪৭ শতাংশের বেশি ছিল। যে সব আফ্রিকানরা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকলাপে ব্যাপৃত থাকত তাদের অমানুষিক শাস্তি দেওয়া হোত। Palmatoria Chicote-র ব্যবহার ছিল অবাধ। Palmatoria কাঠের ডান্ডা যার সামনের দিকে সুবিধার জন্য কিছু ফুটো থাকে। Chicote হচ্ছে চামড়ার চাবুক।

১৯৩২ থেকে ১৯৬৮ সাল অবধি পর্তুগাল ছিল কুখ্যাত স্বৈরাচারী সালাজারের অধীনে। সালাজার ভাবতেন আফ্রিকায় পর্তুগালের শাসন অটুট থাকবে কারণ ওখানকার জনগণের একটা বিরাট অংশ নিজেদের পর্তুগালের বাসিন্দা মনে করে। এটা ঠিক যে বহুসংখ্যক পর্তুগীজ সৈন্য বা অন্য পেশায় কর্মরত ব্যক্তি আফ্রিকান মহিলাকে বিয়ে করেছিল এবং এই উদার race policy'-র জন্য Angola, Mazambique এবং অন্যান্য পর্তুগীজ উপনিবেশে এক করেছি এবং এই উদার 'nace policy'-র জন্য Angola, Mazambique এবং অন্যান্য পর্তুগীজ উপনিবেশে এক বিরাট 'সংকর গোষ্ঠীর' উদ্ভব হয়। সালাজারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এরাই পর্তুগালের হয়ে অবিমিশ্র আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে লড়বে।

পর্তুগালের উপনিবেশগুলিতে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া না থাকায় এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনি হওয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রাম সশস্ত্র, হিংসাত্মক হোল এবং স্বভাবতই গোপন খাতে প্রবাহিত হোল। পশ্চিম আফ্রিকার

Protuguese Guinea সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী ছিল Partido Africano da Independincia da Guinee। Cabo Verde (PAIGC)-এর নেতা ছিলেন American Cabral (PAIGC) কাজ করত সেনেগাল ও গিনির ঘাঁটি থেকে।

Angola-র গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৬১ সাল থেকে। তিনটি গোষ্ঠী পর্তুগালের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। প্রথমটি Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA)। MPLA-র নেতা ছিলেন Dr. Antonio Agostinho Neto। দ্বিতীয় দল ছিল National Union for the Total Independence of Angola (UNITA) নেতার Jonha Savimbi। তৃতীয় দলের নাম Angolan National Liberation Front (FNLA)। নেতার নাম olden Roberto সবাইকে কাজ করতে হোত দেশের বাইরে থেকে। সাহায্য নিতে হোত অন্যান্য আফ্রিকান রাষ্ট্রের কাছ থেকে অথবা পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে পর্তুগাল NATO-র সদস্য ছিল। তাই আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি পর্তুগাল সরকারকে এবং পর্তুগালের গোয়েন্দা বাহিনী PIDE-কে সাহায্য করত।

Mozambian-এর তিনটি সংগ্রামী গোষ্ঠী ১৯৬২ সালে একত্রিত হয়ে Frente de Liberatacao de Mozambique (FRELIMO) তৈরী করল। ট্যাঙ্গোনিকার রাজধানী Dar-es-Salam-এ FRELIMO-র ঘাঁটি স্থাপিত হোল। সভাপতি নির্বাচিত হলেন Dr. Eduarodo Modlane।

পর্তুগীজ গিনি, অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বহুদিন চলেছিল। ১৯৭৪ সালে পর্তুগালে এক সামরিক অভ্যুত্থান হয়। নেতা Spinola। গেরিলা সংগ্রাম পর্তুগালের দুর্বল অর্থনীতিকে দেউলিয়ার পর্যায় নিয়ে এসেছিল। পর্তুগালের পক্ষে সেটা আর সহ্য করা সম্ভব ছিল না। ১৯৭৫ সালে পর্তুগাল আফ্রিকার কলোনীগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

১৪.৯ স্বাধীনতার স্বাদ : বেলজিয়াম শাসিত অঞ্চল

১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০৭ অবধি বেলজিয়ামের রাজা Leopold II মধ্য আফ্রিকার Congo-তে যার বর্তমান নাম Zaire, রাজধানী Kinshasa পুরানো নাম Leopoldille ব্যক্তিগত রাজত্ব করেছেন। সেই বছর বেলজিয়ামের সরকার Congo-কে বেলজিয়ামের উপনিবেশ হিসাবে শাসনভার নেয়। বেলজিয়ামের শাসন প্রণালী ছিল পিতৃতান্ত্রিক। সমস্ত ভাল চাকুরী থেকে বঞ্চিত আফ্রিকানরা সরকারি বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সর্ব নিম্নস্তরে অল্প মাইনেতে জীবন কাটাত। হীরে, কোবাল্ট, তামা, সোনা, শিষে এবং অনেক খনিজ সম্পদে ভরপুর এই দেশের স্থানীয় বাসিন্দারা স্বভাবতই ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করল। গোড়াতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বেআইনী ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করা অসম্ভব হোল। ১৯৬০ সালে বেলজিয়াম কঙ্গোর পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। Abako Party-র নেতা Jorph Kasavisbu প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন, Congoluse National Movement (MNC)-র নেতা Ptrice Lumumba হলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ৭ মাস পরেই কঙ্গো এক নারকীয় গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয় যার জের বহু বছর ছিল।

১৪.১০ স্বাধীনতার স্বাদ ঃ জার্মানি ও ইতালি শাসিত অঞ্চল

আফ্রিকা জমি দখলের ঘোড়দৌড়ে জার্মানি অনেক পরে যোগ দেয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জার্মানি পশ্চিম আফ্রিকায় Cameroon ও Togo দখল করে, দক্ষিণ আফ্রিকায় নেয় South West Africa (বর্তমান নাম Namibia) এবং মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকায় Rwanda-Burundi এবং Ganganyika। ইতালির উপনিবেশ ছিল পূর্ব আফ্রিকায় Eritraca Somilia-তে। জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং যুদ্ধান্তে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তার সমস্ত কলোনীর ওপর অধিকার হারায়। জার্মান কলোনীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তায় League of Nation এর ওপর। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাদের পছন্দমত কোন এক 'সভ্য' রাষ্ট্রকে সেই সব কলোনী শাসন করার দায়িত্ব দেয়। South West Africa শাসনের দায়িত্ব পরে South Africa-র ওপর, Cameroon ও Tago-র আংশিকভাবে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের ওপর, Rwanda Burundi-র দায়িত্ব পায় বেলজিয়াম ও Tangonyika-র শাসনের ভার পায় ইংলন্ড। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘ, জাতিপুঞ্জের দায়িত্ব পায় এবং প্রাক্তন জার্মান কলোনীগুলির শাসনের দায়িত্ব একই রাষ্ট্রের হাতে রাখে।

Cameroon-এর পূর্বাংশ যেটা ফরাসী শাসনে ছিল, এবং পশ্চিমাংশ যেটা ইংলন্ডের শাসনাধীন ছিল দুটোই United Nations-এর Trust Teritory হিসাবে—ঠিক করল তারা একত্রিত হয়ে একটি যুক্তরাজ্য গঠন করবে। ১৯৬১ সালে সেই যুক্তরাজ্য স্বাধীন হয়। দক্ষিণ Camroon ১৯৬০ সালে নাইজেরিয়ার সঙ্গে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রসংঘের ট্রাষ্ট টেরিটরি হিসাবে ইংলন্ড শাসিত Togo ঘানার সঙ্গে যোগ দেয়। ফরাসী শাসিত Togo স্বাধীনতা পায় ১৯৬০ সালে। Sylvanus Olympio ছিলেন Togo-র প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

South West Africa এক বিশাল অঞ্চল। আয়তন প্রায় তিন লক্ষ বর্গমাইল। হীরে ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা গোড়া থেকেই South West Africa-কে নিজের রাজ্য হিসাবে শাসন করত। প্রথমে League of Nation-এর কাছে এবং পরে United Nations-র কাছে তার যে দায়িত্ব ছিল তা কিছুই পালন করত না এবং রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত নির্দেশ অমান্য করত। ১৯৪৮ সালের পর যখন Nationalist Party দক্ষিণ আফ্রিকার ঘৃণ্য apartheid (apartheid ও bantustan এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে দেওয়া আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গে Africans এর বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে) নীতি প্রবর্তন করার চেষ্টা করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার Bantustan নীতিও South West Africa-তে প্রবর্তনের চেষ্টা করছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বে-আইনি কাজ রুখতে বিভিন্ন রাষ্ট্র বেশ কয়েক বার আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে গিয়েছে, রাষ্ট্রসংঘ বিশেষ কমিটি তৈরী করে রিপোর্ট প্রকাশিত করেছে—কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা তার ব্যবহার বদলায়নি।

South West Africa-তে বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়েছিল। শ্বেতকায় ইংরেজ ভাষাভাষীরা গঠন করল United National South West Party (UNSWP), Africans ভাষাভাষীরা দক্ষিণ আফ্রিকার Nationalist Party কেই সমর্থন করত। শহরের বুদ্ধিজীবীদের দল হোল South West African National Union (Swanu)। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের দল এবং সবচাইতে সক্রিয় দল ছিল South West African People's Organisation (SWAPO) যার নেতা ছিলেন Sam Nujoma। জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম, রাষ্ট্রসংঘ

এবং সমস্ত বিশ্বের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে অবশেষে ১৯৯০ সালে সাউথ আফ্রিকা South West Africa-র স্বাধীনতা ঘোষণা করল। Sam Nujoma হলেন নতুন রাষ্ট্র নামিবিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

জার্মানির আর এক উপনিবেশ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলন্ডের তত্ত্বাবধানে আসে League of Nations এর মাধ্যমে। তার নাম Tanganyika (বর্তমানে Zamzibar-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, নাম হয়েছে Tangania)। ট্যাঙ্গানিকার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল Tanganyika African National Union (TANU)। TANU-র অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন Dr. Julius K. Nyerere। ১৯৬০ সালে নির্বাচনে তাঁর দল সংসদের ৭১টি আসনের মধ্যে ৭০টি আসন পায়। ১৯৬১ সালে Tanganyika স্বাধীন হয় এবং ডাঃ নাইজেরি স্বাধীন ট্যাঙ্গানিকার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন।

মধ্য আফ্রিকার জার্মান উপনিবেশ ছিল Rwanda-Burundu-তে। রুয়ান্ডা বুরুন্ডি তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পায় বেলজিয়াম। বেলজিয়াম Congo-র সঙ্গে রুয়ান্ডা-বুরুন্ডি শাসন করত। দুটো দেশই ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে স্বাধীনতা পায়।

ইটালী ইরিট্রিয়া হারাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। ইংল্যান্ড রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে ইরিট্রিয়ার শাসন তত্ত্বাবধান করতে শুরু করল ১৯৪১ সাল থেকে। ১৯৫২ সালে ইরিট্রিয়া ইথিওপিয়ার অংশ হয়। ইরিট্রিয়ার জনগণ কিন্তু সেটা পছন্দ করেনি তাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলতে লাগল। ১৯৯৬ সালের মে মাসে ইরিট্রিয়া স্বাধীনতা পায়।

একই সময়ে ইটালী সোমালিয়া হারিয়েছিল। শাসনের দায়িত্ব এল ইংলন্ডের হাতে। কিন্তু ইংলন্ড কিছুদিন পর ইতালীকে দেয়। সোমালিয়ার যে অংশ ইংলন্ডের কলোনী ছিল সেই অংশের সঙ্গে ইতালীর অংশ যুক্ত হোল। যুক্ত সোমালিয়া স্বাধীন হয় ১৯৬০ সালে। মহম্মদ এগাল (Mohammad Egal) হলেন স্বাধীন সোমালিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

১৪.১১ বর্ণবিদ্বেষের কুৎসিত মুখ

আফ্রিকার কোন কোন উপনিবেশে শ্বেতকায় ইউরোপীয়ানরা বসতি স্থাপন করেছিল। পূর্ব আফ্রিকার কিনিয়াতে ছিল প্রায় ৩০০০০ ইংরেজ। দক্ষিণ রোডেসিয়ার (বর্তমান মান Zimbabwe) ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ শ্বেতকায়। দুটো দেশই ছিল ইংরেজের অধীন। এই শ্বেতকায় ইংরেজদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ওখানকার সরকার অনেক পক্ষপাত দুষ্ট প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিত। তাই ওই সব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। রাজনৈতিক অধিকারের দাবী ও বৈষম্যমূলক জমি বন্টন ও স্থানীয় লোকদের উৎখাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—দুটো আন্দোলন একই সঙ্গে চলে।

কিনিয়ার শ্বেতকায়রা বিশাল খামার করত। Crown Lands Ordinance এর দৌলতে অন্যায়ভাবে শ্বেতকায়রা দেশের সমস্ত ভাল জমি দখল করেছিল। সেখানেই খামার। খামারের জমি দখল করার জন্য একটা বিরাট সংখ্যক আফ্রিকান—বিশেষ করে Kikuyu গোষ্ঠীর লোক—বাস্তুহারা হোল। এই জমিবিহীন লোকদের একটা অংশ গুপ্ত সশস্ত্র আন্দোলনে নামে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলন Man Man আন্দোলন নামে পরিচিত। এই সশস্ত্র গুপ্ত আন্দোলনের পাশাপাশি চলছিল প্রকাশ্য স্বাধীনতা সংগ্রাম। Kikuyu Central Association ছিল প্রথম আফ্রিকান রাজনৈতিক দল। পরে আরও রাজনৈতিক দল তৈরী হয়। Kenya

African National Union (KADU) এই সব দলের মধ্যে সবচাইতে প্রভাবশালী ছিল। কোন কোন অঞ্চলে Kenya African Democratic Union (KADU) প্রভাব ভালই ছিল। KANU-র সব চাইতে বড় নেতা ছিলেন Jomo Kenyatta। Kenyatta সশস্ত্র আন্দোলন ও Man Man দের সঙ্গে যুক্ত এই অভিযোগে ঔপনিবেশিক সরকার প্রায়ই তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে রাখত। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে লন্ডনের Lancastu House-এ তিনটি অধিবেশন হয় কিনিয়ার রাজনৈতিক নেতা ও ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। ১৯৬৩ সালে অধিবেশনে স্বীকৃত শর্ত অনুযায়ী ওই বছর ডিসেম্বর ১২ তারিখে জেমো কেনিয়াট্টা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কিনিয়া স্বাধীন হয়। এক বছর পর কিনিয়া Republic-এ পরিণত হয়। KADU KANU-র সঙ্গে মিলে যায়। জোমো কেনিয়াট্টা হন কিনিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি। সদ্যলুপ্ত KADU-র নেতা Oginga Odinga নির্বাচিত হন উপ-রাষ্ট্রপতি।

দক্ষিণ রোডেসিয়ার আড়াই লক্ষ শ্বেতকায় বেশ কিছু বড় খামারের মালিক ছিল এবং ঔপনিবেশিক শাসনে অনেক বিশেষ সুবিধা উপভোগ করছিল। তারা চাইছিল না দক্ষিণ রোডেসিয়া স্বাধীন হোক। সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকানদের সরকার তৈরী হলে সেই সব সুবিধা আর থাকবে না, তাই তাদের নেতা Ian Smith ১৯৬০ সালে দক্ষিণ রোডেসিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলেন। তখনো দক্ষিণ রোডেসিয়া ইংরেজ কলোনী। এই ঘোষণাকে বলা হয় Unilatral Declaration of Independence (UDI)। লন্ডন সেই ঘোষণাকে অবৈধ মনে করত। ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী Harold Wilson ইয়ান স্মিথ এর সরকারের বিরুদ্ধে 'অর্থনৈতিক অবরোধ' আরোপ করলেন। ইয়ান স্মিথের বে-আইনী সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার অনুকরণে বিভিন্ন ধরনের বর্ণভিত্তিক বৈষম্যমূলক আইন প্রনয়ণ করল। বছর দুই পর রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সীমিত 'সামরিক অবরোধ' আরোপ করে দক্ষিণ রোডেসিয়ার বিরুদ্ধে। হারল্ড উইলসন্ ভাবতেন অর্থনৈতিক অবরোধের চাপে স্মিথের অবৈধ সরকারের কিছুদিনের মধ্যেই পতন হবে। কিন্তু দক্ষিণ রোডেসিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকা, পর্তুগীজ কলোনী মোজাম্বিক ও এ্যাঙ্গোলা প্রকাশ্যে এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ গোপনে স্মিথের সরকারকে সব ব্যাপারে সাহায্য করছিল। তাই স্মিথের সরকার ১৩ বছর—অর্থাৎ ১৯৭৮ সাল অবধি ইংলন্ড, রাষ্ট্রসংঘ ও তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও চলছিল। অর্থনৈতিক চাপ ও রাজনৈতিক একাকীত্ব ক্রমশ স্মিথকে দুর্বল করে দেয়। তাই স্মিথের সরকার বছর দুই নানান ধরনের রাজনৈতিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেন। উদ্দেশ্য ছিল তার নিজের পছন্দসই এক আফ্রিকানকে মসনদে বসিয়ে পর্দার অন্তরাল থেকে মূল শাসন চালানো। সেটা বেশি দিন চলল না। স্বাধীনতা পেতে এবং পরবর্তীকালে স্মিথের বেআইনী সরকার দূর করতে বেশ কয়েকটি আফ্রিকান রাজনৈতিক দল তৈরী হয়েছিল।

যেহেতু দেশে রাজনীতি বে-আইনী ছিল, সেই সংস্থাগুলি আফ্রিকার অন্য দেশে ঘাঁটি করে কাজ করত। এদের মধ্যে সব চাইতে প্রভাবশালী ছিল Joshna Nkoma-র নেতৃত্বে তৈরী Zimbabwe African People's Union (ZAPU) এবং Sithobe-র Zimbabwe African National Union (ZANU) Sithobe পর ZANU-র নেতা হন Robert Mugabe। রাষ্ট্রসংঘ, কমনওয়েলথ্, ইংরেজ সরকার এবং আরও অনেক সংস্থার মধ্যস্থতায় অবশেষে রোডোসিয়ার রাজনৈতিক অব্যবস্থার অবসান হোল। ১৯৮০ সালে সাধারণ নির্বাচন হল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সংসদে নেতৃত্ব পেল ZANU। Robert Mugabe প্রথম কৃষ্ণকায় আফ্রিকান রাষ্ট্রপতি হিসাবে জিম্বাবোয়ের শাসনভার গ্রহণ করলেন।

আফ্রিকায় বসতি স্থাপন করে শ্বেতকায়রা সব চাইতে জটিল সমস্যার তৈরী করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ওলন্দাজরা Cape of Good Hope-এ বসতি স্থাপন করে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের পরাস্ত করে ভেতরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। তারপর আসে ইংরেজরা। দুয়ের সংঘর্ষ হয় অনিবার্য। যে সব ওলন্দাজরা ওখানে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের বলা হত Boer অথবা Afrikaners। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে বুয়ররা পরাস্ত হয়। Transuae ও Orange Free State-এ বুয়রদের এক ধরনের স্বায়ত্বশাসন দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরেজরা তাদের সঙ্গে আপোষ করে। ১৯১০ সালে Union of South Africa তৈরী হয়। প্রায় শুরুতেই শ্বেতকায়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংখ্যালঘু সরকার কৃষ্ণকায়দের বঞ্চিত করে বৈষম্যমূলক ভূমি বন্টন করে। দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ, ১৪ শতাংশ শ্বেতকায়। এছাড়া রয়েছে ভারতবর্ষ থেকে আসা লোকেদের সন্তান সন্ততিরা এবং বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে জাত এক সম্প্রদায় যাকে বলা হয় 'Coloured'। নতুন ভূমি আইনের ফলে ১৪ শতাংশ শ্বেতকায়রা দেশের ৮০ শতাংশ জমির মালিক হয়।

দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ কৃষ্ণকায়রা পেল মাত্র ১৩ শতাংশ জমি। এবং সে জমিও বহুলাংশে অনুর্বর। ১৯৪৮ সালে National Party ক্ষমতায় আসে এবং বর্ণভিত্তিক ঘৃণ্য বৈষম্যমূলক আইন প্রবর্তন করে। সম্মিলিতভাবে এই আইন প্রয়োগের ফলে যে প্রথা প্রবর্তিত হল তাকে বলা হয় Apartheid। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সাদা-কালোর বৈষম্য কুৎসিত আকারে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন পায়। দক্ষিণ আফ্রিকার সব চাইতে পরিচিত ব্যক্তিত্ব Nelson Mandela তাঁর জীবনী 'Long Walk to Freedom'-এ অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় অত্যাচারিত কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। "It was crime to walk through a whites onlydoor, a crime to ride a whites only bus, a crime to use a whites only drinking fountain, a crime to walk on a whites only beach, a crime to be on the streets past eleven, a crime not to have a psssbook and a crime to have the wrong signature on that book, a crime to be unemployed and a crime to be employed in the wrong place, a crime to live in a certain place and a crime to have no place to live."

রাজনৈতিক ও সামরিক জীবনের এই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায়দের সংগ্রামের দুটো দিক ছিল। প্রথমত apartheid এর বিরুদ্ধে লড়াই করে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়ত অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘুর সরকার সরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠদের সরকার গঠন। আফ্রিকার অন্যান্য দেশের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের পার্থক্য এই যে অন্যান্য দেশ শাসন করত ইংরেজ বা ফরাসী বা পর্তুগীজরা লন্ডন, প্যারিস বা লিসবন থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার চালাত যারা তারা ওখানকার বাসিন্দা। তাদের পূর্ব-পুরুষরা ২০০ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিল। এদের অন্য কোথাও চলে যাবার জায়গা নেই।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে শ্বেতকায়দের একটা অংশ apartheid সমর্থন করত না। United Party, Progressive Party, Liberal Party—সবই ছিল শ্বেতকায়দের রাজনৈতিক দল। কিন্তু এই দলগুলি বর্ণবৈষম্যের অবসান, মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করত। কিন্তু এদের অনেকেই শ্বেতকায়দের রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় থাক—সেটা চাইত।

কৃষ্ণাঙ্গদের সব চাইতে পুরানো রাজনৈতিক দল Atrican National Congress (ANC)। ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলে উদারপন্থী অনেক শ্বেতকায় সদস্য বা সমর্থক হিসাবে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার Communist Party ১৯৫১ সালে বে-আইনী হয়ে যাবার পর গোপনে ANC-র সঙ্গে মিলে কাজ করছিল। ১৯৬০ সালে ANC বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়। এর কারণ ঐ বছরের একটি ঘটনা যা ইতিহাসে Sharpeville massacre নামে পরিচিত। দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ 'পাশ আইনের' বিরুদ্ধে সমাবেশে Sharpeville ও Langa শহরে গুলি চালায়। ঐ ঘটনা ও পরবর্তী ঘটনাগুলিতে ৮৩ জন কৃষ্ণাঙ্গ প্রাণ হারায় ও ৩৬৫ জন আহত হয়। সরকার সশস্ত্র ও অহিংস এক সমাবেশে পরিকল্পনা অনুযায়ী গুলি চালিয়ে অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরী করে এবং ২০০০ আফ্রিকান নেতাকে গ্রেপ্তার করে। একই সময় কৃষ্ণাঙ্গদের আরও একটি রাজনৈতিক দল Pan-Africanist Congress (PAC) বে-আইনী ঘোষিত হয়। কৃষ্ণাঙ্গদেরগোপনে কাজ করা ও চরমপন্থী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

ANC-র প্রথম দিকের নেতা ছিলেন Albert Luthuli। তাঁর ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠা ও নির্ভীক সংগ্রামের জন্য সমস্ত বিশ্ব তাঁকে সম্মান জানিয়েছিল শান্তির নোবেল পুরস্কার দিয়ে। তারপর ANC পায় Olivu, Tambo Nelson Mendela ও Thabo Mabeki-র মত অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার Suppression of Communism Act এর ধারা অনুযায়ী অথবা 'teason' এর অভিযোগ এনে এদের অনেককেই জেলে বন্দী করে রেখেছিল। নেলসন ম্যান্ডেলা জীবনের ২৭ বছর জেলে কাটিয়েছেন সাধারণ কয়েদীদের মত কায়িক পরিশ্রম করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার অমানবিক সমাজ ব্যবস্থা, স্বৈরাচারী শাসন পদ্ধতি রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা হয়েছে। কমনওয়েলথ্ও এ নিয়ে অনেক উত্তপ্ত আলোচনায় ব্যাপৃত হোত এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার কিন্তু এ সবে আমল দিত না। রাষ্ট্রসংঘে পর্তুগাল ছাড়া অন্য কোন দেশ তার সপক্ষে ভোটদিত না। মাঝে মাঝে পশ্চিমী রাষ্ট্রের কেউ কেউ ভোটদানে বিরত থাকত, যদিও বিপুল ভোটে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হোত।

আর্ন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার 'Bantustan Policy' নামে নতুন এক প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করল। বিভিন্ন Tribe-দের কেন্দ্র করে বিভিন্ন অঞ্চলে তথাকথিত 'স্বাধীন রাষ্ট্র' তৈরি করল। সরকারের সঙ্গে সদ্ভাব আছে এমন কিছু লোককে এই সব 'স্বাধীন রাষ্ট্রের' সর্বোচ্চ পদে বসান হোল। বলা হল কৃষ্ণাঙ্গারা বিভিন্ন অঞ্চলে এখন নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করছে। সেখানে apartheid নেই এবং শ্বেতকায়দের একচেটিয়া রাজনৈতিকক্ষমতার ব্যবহার নেই। কিন্তু এই সব 'রাষ্ট্র' আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পেল না। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ধারার কোন গোষ্ঠীই এই 'Bantustan' নীতিকে একেবারেই আমল দিল না।

দেশের অভ্যন্তরে সর্বস্তরে নিরবচ্ছিন্ন বিক্ষোভ, মাঝে মাঝে সশস্ত্র সরকার বিরোধী অভ্যুত্থান, সমস্ত বিশ্বে নিন্দা ও আন্তর্জাতিক সংগঠন, ক্রীড়া, প্রতিযোগিতা ও সমাবেশ থেকে বহিষ্কার আর বেশি দিন সহ্য করা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের পক্ষে সম্ভব হোল না। ১৯৯০ সালে নেলসন ম্যান্ডেলা মুক্তি পেলেন। দেশের রাষ্ট্রপতি F. W. de clerk কৃষ্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। Apartheid দূর হোল এবং জাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রকৃত গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম নির্বাচনের দিন স্থির হোল। সেই নির্বাচনে

ANC বিপুল ভোটে জয়ী হয়। ১৯৯৪ সালে নেলসন মান্ডেলা প্রকৃত স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি হিসাবে গণতান্ত্রিক সরকারেরকার্যভার গ্রহণ করেন। সাব-সাহারাণ আফ্রিকার রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের অবসান হোল।

১৪.১২ পশ্চিমের রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও পরাধীন আফ্রিকা

আফ্রিকার জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। যদিও পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম জোরালো হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। চলে কয়েক দশক অর্থাৎ মুক্তি আন্দোলনের মূল অধ্যায় এবং ঠান্ডা লড়াই একই সময় চলছিল। সেই ঠান্ডা লড়াই-এর দুই নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের তাবেদার রাষ্ট্রগোষ্ঠী কিভাবে আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনকে দেখত সে সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আমরা লক্ষ্য করেছি পর্তুগাল শাসিত দেশগুলিও দক্ষিণ আফ্রিকা সবার শেষে স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক সরকার পেল। তাই এই দুই দেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মনোভাব আলোচনা করলেই এ বিষয়ে কিছু ধারণা হবে।

পর্তুগাল ছিল NATO-র সক্রিয় সদস্য এবং পর্তুগালের সংজ্ঞা অনুযায়ী Angola, Mozambique ইত্যাদি পর্তুগীজ কলোনীগুলি ছিল পর্তুগালের অচ্ছেদ্য অংশ। উপনিবেশ নয়। তাই NATO-র সদস্য হিসাবে পর্তুগাল NATO-র কাছে তার 'Overseas Territory' রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সাহায্য চাইতে পারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা সেই সাহায্য দিত। PIDE ছিল পর্তুগালের Secret Police Service। PIDE, NATO-র সদস্যদের কাছ থেকে প্রচুর তথ্য ও আধুনিক সরঞ্জাম পেত। সেই সাহায্য পর্তুগালকে মুক্তি আন্দোলন দমন করতে খুব সাহায্য করেছে। পর্তুগালের কলোনীগুলির আন্দোলন ছিল সশস্ত্র ও গুপ্ত। তাদের নেতারা বাধ্য হয়ে ঠান্ডা লড়াই-এর বিপরীত মেরুতে যেতেন সাহায্যের জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা অনুগামী পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি অস্ত্র, খাদ্য, চিকিৎসার সাহায্য ও কুটনৈতিকসাহায্য দিত। আন্দোলনে যুক্ত-আফ্রিকার দলগুলির সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে এই সম্পর্কের জন্য পর্তুগাল তাদের দমনের অভিযানকে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযান বলে চালাত। ফলে আমেরিকা ও কম্যুনিষ্ট বিরোধী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির নিরবচ্ছিন্ন সাহায্য পর্তুগাল পেত।

দক্ষিণ আফ্রিকা হীরে, সোনা, কয়লা এবং অন্যান্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অনন্য এক দেশ। সেই খনিজ সম্পদ ভূগর্ভ থেকে তোলা, তাকে ব্যবহারযোগ্য করে এবং পৃথিবীর বাজারে পাঠানোর সমস্ত কাজ করত বহুজাতিক কোম্পানীগুলি যাদের মূল ঘাঁটি আমেরিকা, ইংলন্ড, ফ্রান্স বা জার্মানীতে। দক্ষিণ আফ্রিকার সব বড় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও একইভাবে পশ্চিমী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমেরিকা সরাসরি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে সামরিক সাহায্য করত না কিন্তু ইংলন্ড উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটস্থ Simonstown-এ একটি সামরিক ঘাঁটির তত্ত্বাবধান করত। আমেরিকার সামরিক সাহায্যও পর্তুগাল এবং ইজরাইলের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারেরকাছে পৌঁছত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ

নাই। আফ্রিকার সবচাইতে মজবুত অর্থনীতি দক্ষিণ আফ্রিকার। তার সাথে বাণিজ্যের প্রলোভন ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী কিছুতেই দমন করতে পারত না। ফ্রান্স ও জার্মানী সামরিক বিমান, আগ্নেয়াস্ত্র সব কিছুই বিক্রি করত দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

আগেই বলা হয়েছে রাজনৈতিক কার্য-কলাপ বে-আইনী হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের আন্দোলন ছিল সশস্ত্র ও গোপন। Angola ও Mozambique-এর মত এদেরও সাহায্য আসতো সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ বা চীন থেকে। কম্যুনিস্ট সংযোগের কথা বলে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার Suppression of Communism Act ব্যবহার করে আন্দোলন দমন করত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কম্যুনিষ্ট বিরোধী দলগুলির সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহায্য আদায় করত। ঠাণ্ডা লড়াই এর যুগে এটা ছিল তুরুপের তাস। মার্কিনসহানুভূতি পেতে এই অস্ত্র ছিল অমোঘ।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্ণের ভিত্তিতে এক ধরনের সহানুভূতি দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু শ্বেতকায়দের সরকার বিশ্বের প্রায় সব শ্বেতকায়দের দেশে পেত। কৃষ্ণাঙ্গরা জাতি হিসাবে নিকৃষ্ট ও অকর্মণ্য— ঊনবিংশ শতাব্দীর এই অবৈজ্ঞানিক নৃতাত্ত্বিক ধারণা যা ঔপনিবেশবাদকে পুষ্ট করেছে, দুর্ভাগ্যবশত সেই মনোভাবের জের বিংশ শতাব্দীতে চলছিল।

১৯৬৩ সালে আফ্রিকার দেশগুলি মিলিত হয়ে Organisation of African Unity তৈরি করে। মূল অফিস হয় ইথিওপিয়ার রাজধানী Addis Ababa-তে। আফ্রিকার দেশগুলিকে তাদের মুক্তি আন্দোলনে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। OAU তার 'Liberation Committee'-র বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করেছিল।

১৪.১৩ ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভৌগোলিক কারণে ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মিল থাকায় আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনে ভারতবর্ষ নীরব দর্শক ছিল না। আফ্রিকার ব্যাপারে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের ঔৎসুক্য বহু পুরানো। মুসোলিনী ইথিওপিয়া আক্রমণ করলে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে তার নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশজুড়ে Abbysinia Day (ইথিওপিয়ার পুরানো নাম) পালিত হয়েছিল। আফ্রিকার অনেক দেশে ভারতীয় বংশদ্ভুত অনেকে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে আছে। তাদের সংখ্যা প্রচুর। সাংস্কৃতিক ও আবেগজনিত কারণে তারা এখনো দুঃসময়ে ভারতের দিকে তাকায়। তাছাড়া জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক হাতে খড়ি দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় দুই দশক ছিলেন। নীতিগতভাবে ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সাহায্য করবে— এটাই স্বাভাবিক। আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পর্তুগালের সঙ্গে ভারতের বিবাদ গোয়া দখল নিয়ে। আফ্রিকার পর্তুগালের অত্যাচারীর ভূমিকা সেই বিবাদকে নতুন মাত্রা দিল। ভারতের সঙ্গে পর্তুগালের বহুদিন কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গেও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। কমনওয়েলথ্-এর সমাবেশে, রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক সমাবেশে ভারতীয় প্রতিনিধিরা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারি নীতির বিপক্ষে সোচ্চার ছিল। আফ্রিকার নেতারা বিভিন্ন ব্যাপারে ভারতবর্ষের সাহায্যের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান আফ্রিকার একটি রঙ্গীন মানচিত্র দেওয়া প্রয়োজন। মানচিত্রে আফ্রিকার সমস্ত দেশগুলির নাম ও রাজধানীর নাম থাকলে ভাল হয়। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলেও ভাল হয়—সাহারা, কালাহারি, নীলনদ, লেক ভিক্টোরিয়া ইত্যাদি।

১৪.১৪ অনুশীলনী

১. আফ্রিকার জাতীয়তাবোধ উন্মেষের ব্যাপারে কি কি ধারণা বা ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল?

২. একদিকে ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশ অন্যদিকে পর্তুগালের কর্তৃত্বাধীনে কয়েকটি দেশ—এই দুয়ের প্রশাসনিক ব্যাপারে পার্থক্য ও মুক্তি আন্দোলনে চরিত্রগত পার্থক্য সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ লিখুন।

৩. দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধের চরিত্রগত পার্থক্য, আন্দোলনের বিবর্তন এবং অবশেষে সংখ্যা গরিষ্ঠদের বিজয় সম্পর্ক একটি নিবন্ধ লিখুন।

৪. নামিবিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে যাহা জানেন লিখুন। ওখনকার মুক্তি আন্দোলন আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের আন্দোলন থেকে পৃথক কেন?

৫. আফ্রিকার দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির ভূমিকা কি ছিল?

৬. জিম্বাবোয়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য কি?

৭. আফ্রিকার খ্রীষ্টানদের এক অংশ কেন নিজস্ব চার্চ তৈরী করলেন? সেই আফ্রিকান চার্চগুলির বৈশিষ্ট্য কি ছিল?

৮. আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষের ভূমিকা কি ছিল?

৯. টীকা লিখুন ঃ

(ক) Negritude
(খ) Langston Hughes
(গ) Leopold Senghor
(ঘ) Pan African Congress
(ঙ) Atlantic Charter
(চ) Albert Luthuli
(ছ) Kwame Nkrumah
(জ) lan Smith
(ঝ) African National Congress
(ঞ) Battle of Adowa
(ট) Bantustan Policy.

(১-৫ প্রশ্নগুলির উত্তর অপেক্ষাকৃত বড় হবে। ৬-৮ অপেক্ষাকৃত ছোট।
৯ স্বভাবতঃই ছোট আকারের এগারটি উত্তর।)

১. সাব-সাহারান আফ্রিকার অবস্থান কোথায়?

(ক) আফ্রিকার উত্তর প্রান্তে

(খ) সাহারা মরুভূমির পশ্চিমে

(গ) সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে

(ঘ) সাহারা মরুভূমির পূর্ব প্রান্তে।

২. পর্তুগীজ নাবিকদের অভিযানের আগে ইউরোপের অধিবাসীরা—

(ক) উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে কিছুই জানত না

(খ) সাব-সাহারান আফ্রিকা সম্পর্কে কিছুই জানত না

(গ) সাব-সাহারান আফ্রিকার দু-একটি দেশ বাদে বাকীদের সম্পর্কে কিছুই জানত না

(ঘ) সমস্ত আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছুই জানত না।

৩. বাদাম, কোকো, কফি ইত্যাদি ইউরোপ-আফ্রিকা বাণিজ্যের—

(ক) তৃতীয় অধ্যায়ের পণ্য

(খ) প্রথম অধ্যায়ের পণ্য

(গ) দ্বিতীয় অধ্যায়ের পণ্য

(ঘ) এগুলি কখনোই কোনো বাণিজ্যের পণ্য ছিল না।

৪. নীচে দুটি তালিকা আছে। প্রথমটি আফ্রিকার দেশের নামেরতালিকা, দ্বিতীয়টি ইউরোপের দেশের নামের তালিকা যারা আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। প্রথম তালিকা কার সঙ্গে মেলে দ্বিতীয় তালিকা করে সেটা দেখাও।

তালিকা-১	তালিকা-২
A মেজোম্বিক	1 ইংরেজ উপনিবেশ ছিল
B উগান্ডা	2 বেলজিয়ামের উপনিবেশ ছিল
C আইভরি কোষ্ট	3 পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল
D কঙ্গো	4 ফ্রাসের উপনিবেশ ছিল

	A	B	C	D
(ক)	3	1	2	4
(খ)	1	3	2	4
(গ)	4	1	2	4
(ঘ)	3	1	4	2

৫. Pan-African Congress-এর প্রথম অধিবেশন হয়েছিল কোথায়?

(ক) নিউইয়র্ক

(খ) কায়রো

(গ) জেনেভা

(ঘ) লন্ডন

৬. আফ্রিকান অর্থডক্স চার্চের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

(ক) হ্যারিস

(খ) মার্কাস গার্ভে

(গ) ব্লেক ম্যাডোনা

(ঘ) এদের কেউ নয়।

৭. প্রথম তালিকায় আছে কয়েকটি আফ্রিকার দেশের পুরানো নাম। দ্বিতীয় তালিকায় আছে সেই দেশগুলির নতুন নাম। কোন নামটা কার ছিল মেলাও।

তালিকা-১	তালিকা-২
A বেচুয়ানাল্যান্ড	1 জাম্বিয়া
B নর্দান রোডেসিয়া	2 নামিবিয়া
C আপার ভল্টা	3 বটস্ওয়ানা
D সাউথ্ ওয়েষ্ট আফ্রিকা	4 বার্কিনা ফাসো

	A	B	C	D
(ক)	1	3	2	4
(খ)	3	1	4	2
(গ)	3	1	2	4
(ঘ)	4	2	1	3

৮. কোন সালে নেলসন ম্যান্ডেলা কারগার থেকে মুক্তি পেলেন?

(ক) ১৯৯৮

(খ) ১৯৯২

(গ) ১৯৯০

(ঘ) ১৯৯১

৯. কোন সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হোল?

(ক) ১৯৯১

(খ) ১৯৯৪

(গ) ১৯৯৭

(ঘ) ১৯৯৩

১০. কোন্ রাজনৈতিকদল কোন দেশের নীচে দেওয়া তালিকা থেকে মেলাও।

তালিকা-১	তালিকা-২
A কনভেনশন পিপ্লস্ পার্টি	1 সাউথ আফ্রিকা
B ইউনাইটেড ন্যাশানাল ইনডিপেন্ডেস্ পার্টি	2 নামিবিয়া

C সাউথ ওয়েষ্ট আফ্রিকান পিপ্‌লস অর্গানাইজেশন 3 জাম্বিয়া

D আফ্রিকান্ ন্যাশনাল কংগ্রেস 4 ঘানা

	A	B	C	D
(ক)	1	2	3	4
(খ)	1	2	4	3
(গ)	4	3	1	2
(ঘ)	4	3	2	1

১১. ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল অবধি ইরিট্রিয়া কার সঙ্গে যুক্ত ছিল?

(ক) ইতালী
(খ) ইথিওপিয়া
(গ) ইংলন্ড
(ঘ) রাষ্ট্রসংঘ

১২. ইয়ান স্মিথের 'ইউনিল্যাটারেল ডিক্লারেশন অব ইন্‌ডিপেন্ডেস' কোন দেশ সমর্থন করেছিল?

(ক) শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা
(খ) রাষ্ট্রসংঘ
(গ) ইংলন্ড
(ঘ) দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগাল

১৩. 'শার্পেভিল হত্যাকান্ড' কোন সালে হয়েছিল?

(ক) ১৯৬০
(খ) ১৯৬২
(গ) ১৯৬৬
(ঘ) ১৯৬৪

১৪. দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ শ্বেতকায় রাষ্ট্রপতি ছিলেন কে?

(ক) পি. ডব্লু. বোথা
(খ) ইয়ান স্মিথ
(গ) ডেসমন্ড টুটু
(ঘ) এফ. ডব্লু. ডি ক্লার্ক।

১৫। প্রথম তালিকায় কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম আছে। দ্বিতীয় তালিকায় কয়েকটি দেশের নাম আছে। কে কোথাকার মেলাও।

তালিকা—১	তালিকা—২
A জোমো কেনিয়াট্টা	1. টানজানিয়া
B নান্‌দি আনিকোয়ে	2. পর্তুগীজ গিনি
C জুলিয়াস নাইরোবি	3. নাইজেরিয়া
D আমিলকার কাব্রাল	4. কিনিয়া

	A	B	C	D
(ক)	4	3	2	1
(খ)	1	2	3	4
(গ)	4	3	1	2
(ঘ)	2	1	3	4

১৪.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

1. 'A History of Africa' by J. D. Fage, Hutchinson & Co. (London), 1985
2. 'Pan-Africanism : A short Political Guide' by Colin Legum, Frederick Praeger, (New York), 1962
3. 'Nationalism in Colonial Africa' by Thomas Hodgkin, New York University Press (New York), 1969.
4. 'Long Walk to freedom : The Autobiography of Nelson Mandela' by Nelson Mandela (Little Brown).
5. 'Time Longer Than Rope' by Edward Roux, The University of Wiscondin Press, (Madison), 1996.